উন্নত নৈতিক মান ও সঠিক রাস্তায় লড়াই চাই

এই আলোচনায় সমাজের গভীর ও মৌলিক সমস্যাবলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। আদর্শ ঠিক করা, নীতি ঠিক করা, লড়াইয়ের রাস্তা ঠিক করা, লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ঠিক করা — সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মূল রোগ কী — এই সব অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

সারা ভারত ডি এস ও'র এই সম্মেলন ভারতবর্ষের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। দেশের সামনে অনেক সমস্যা। আর্থিক সমস্যা কী ভয়ানক রূপ নিয়েছে, সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনারা সকলেই তা জানেন। তাকে বাড়িয়ে ফেনিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমি বলতে চাই না। জিনিসপত্রের দাম কেমন বাড়ছে, মানুষের কত দুর্গতি, কী অবস্থা সাধারণ মানুষের, সেসব আপনারা আমার থেকে ভালই জানেন। আমরা নেতা হয়ে একটু উপরে আছি আর কি! অত দুর্গতি আমরা ভোগ করি না, যত দুর্গতিতে আপনারা বাস করেন। ফলে ওটাই বাড়িয়ে ফেনিয়ে আমি বলতে চাই না। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা রয়েছে, সমাধান হচ্ছে না, দিনের পর দিন আরও খারাপ হচ্ছে অবস্থা। এ নিয়ে হা-হুতাশ করা বা শুধু বিক্ষোভ প্রকাশ করা, বা কখনও কখনও বিক্ষোভে মাঠে-ময়দানে ফেটে পড়া — এতে সমস্যার সমাধান হবে না, যদি না কোনও কিছু করবার আগে সমস্যা কোথায়, কোন জায়গায়, তার মূল কারণটি কী, তা আমরা ধরতে পারি এবং রাস্তা ঠিক করতে পারি। রাস্তা ভুল হলে, দিক নির্ণয় করতে ভুল হলে, কারণ নির্ধারণ করতে ভুল হলে, সমস্যার সমাধান হবে না। যেমন একজন ডাক্তার যত সততা ও নিষ্ঠার সাথে চিকিৎসা করুন, রোগীর সংকটজনক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ে ডাক্তার যদি ভুল করেন, তাহলে যেমন রোগী বাঁচে না, রোগী

অনিবার্যভাবে মারা যায়, তেমনি সমাজজীবনে যে রোগ, অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে রোগ দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ যদি আমরা ঠিক ঠিক নির্ণয় করতে না পারি, তাহলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে আমরা হাত-পা ছুঁড়তে পারি, কিছু লোক গুলি খেতে পারি, জীবন কোরবানি করতে পারি, মরতে পারি, কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না।

তাই আপনারা দেখবেন, এ দেশে লড়াই কম হয়নি। এ দেশের যুবকরা, ছাত্ররা, নওজোয়ানরা কম লড়াই করেনি। এ দেশের মজুর-চাষী কম খুন ঢালেনি। কোরবানি অনেক হয়েছে, বহুবার বহু লড়াই হয়েছে, বহু আত্মত্যাগ হয়েছে, কিন্তু দেশের মূল সমস্যা যে জায়গায় ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বরং অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হচ্ছে। কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। অবস্থা এরকম চলতে থাকলে কালই আবার একটা লড়াই হবে! হবে লড়াই। আমি চাইলেও হবে, না চাইলেও হবে। বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো নেতৃত্ব থাক না থাক, ভুল পথ হোক ঠিক পথ হোক, যখন সহ্য করতে পারবে না তখন আবার মাঠে-ময়দানে নেমে পড়বে। কিন্তু তার ফলে শুধু কোরবানি করাই সার হবে, আত্মত্যাগই সার হবে, গুলি খাওয়াই সার হবে, সমস্যার সমাধান হবে না— যদি না সেই লড়াই করবার বা ময়দানে নামবার আগে রোগ কী তা বুঝতে পেরে থাকি এবং কোন পথে, কীভাবে, কাকে, কোথায় আঘাত হেনে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি। এখানে ভুল করলে আবার লড়াই হবে, আবার মানুষ পর্যুদস্ত হবে, আবার হতাশা জনমনকে ছেয়ে ফেলবে।

লক্ষ করলে দেখবেন, একটা লড়াই যখন আসে, একটা আন্দোলন যখন আসে, মানুষ তখন কোনও যুক্তি শুনতে চায় না। তখন যদি লড়াইয়ের রাস্তাটা নিয়ে, লড়াইয়ের নীতি নিয়ে, লড়াইয়ের আদর্শ নিয়ে, বা লড়াই কোন পথে হবে, কী কৌশলে হবে সে ব্যাপারে কোনও আলাপ-আলোচনা তোলবার চেষ্টা হয়, প্রশ্ন তোলার চেষ্টা হয়, লড়াইটা ভুল পথে হচ্ছে বলে বলবার চেষ্টা হয়, তখন সকলে মিলে তাকে চেপে ধরার চেষ্টা করে। বলে, এখন লড়াই হচ্ছে, এখন কোনও তত্ত্ব আলোচনা নয়, এখন রাস্তা ঠিক কি বেঠিক এসব কথা নয়, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে। এখন লড়াইয়ের সময়, অন্য কোনও কথা বলবার নেই বলে তারা এ ব্যাপারে সমস্ত যুক্তি, সমস্ত আলাপ-আলোচনা, এমনকী রাস্তা ঠিক করবার মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকেও লড়াই করার উন্মাদনায় চাপা দিতে চায়। এর ফল কী হয়? লড়াই মার খায়। মার খাওয়ার পরে মানুষের মধ্যে আসে হতাশা। হতাশার পরে তাদের মধ্যে কী মানসিকতা আসে? তারা

বলতে থাকে, 'ওতো দেখা গেল, অনেক লড়াই হল, অনেক জেলে যাওয়া হল, অনেক কোরবানি করা হল, কত কিছু করা হল — ও কিছু হবে না। এ দেশে কিছু হবে না। ও মানুষই সব খারাপ হয়ে গেছে। সব পার্টিকে দেখলাম মশাই, যান যান, সব দেখা আছে। এইতো কংগ্রেসকে দেখলাম, সি পি আই-কে দেখলাম, এইতো সি পি আই (এম)-কে দেখলাম, এই তো সোস্যালিস্টদের এই অবস্থা হয়েছে, এই নকশালপন্থীরা বিপ্লব করল তাদেরও দেখলাম। এখন তারা এইসব বলছে। আপনারা আবার কোথা থেকে এক সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার, নাকি ডি এস ও এসেছেন। আপনারা আবার বলছেন, সমস্যার সমাধান করবেন। সব জানা আছে মশাই। ওসব কিছু হবে না, এদেশে কিছু হবে না।' সংক্ষেপে সমস্ত মানুষের মধ্যে এই ধারণাই হচ্ছে লড়াইয়ের পরিণতি। হতাশা থেকে তাদের মানসিকতা এই কথায় দাঁড়ায় যে, 'সকলকে দেখা গেছে, কারুর দ্বারা কিছু হবে না।'

আর এই অবস্থার সুযোগে শাসক সম্প্রদায়, যারা দেশকে শাসন করছে সেই শোষকবর্গ, বুর্জোয়াশ্রেণি ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলি শাসনের যন্ত্রটাকে, শোষণের যন্ত্রটাকে জনমনের এই হতাশা, রাজনৈতিক এই হতাশা এবং তার ফলে জনগণের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা গড়ে ওঠে, হতে পারে তা সাময়িক, তাহলেও এসবের সুযোগে রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে আরও সংহত করতে সুযোগ পায় মাত্র। কিন্তু, হতাশায় 'কিছু হবে না'— একথা বলে তো বসে থাকা যায় না। পেট বড় বালাই। জীবন অত্যন্ত কঠিন। 'কিছু হবে না' বলে বসে থাকার উপায় নেই। আবার মার খেয়ে পাগলের মতন মাঠে-ময়দানে নামতে হবে। নামতে হবেই, লড়াই আসবেই। যদি বুঝতাম, 'কিছু হবে না' বলে আর কোনদিন আপনারা লড়বেন না, যেমন করে আপনাদের কুকুর-বেড়ালের মতো রাখা হয় তেমন করেই অভ্যস্ত হতে হতে পশুর মতো জীবনে নেমে যাবেন, কোনওদিন প্রতিবাদ করবেন না, তাহলে বুঝতাম, এসব মানসিকতার মানে আছে। কিন্তু বাস্তবে তা হবে না। জীবনের অসহ্য সংকট আবার আপনাদের লড়াইয়ের ময়দানে টেনে আনবেই, লড়তে আপনারা বাধ্য হবেনই। ফলে যতবারই মার খেয়ে থাকুন, যত পরাজয় হয়ে থাকুক, রাস্তা যতবার ভুল হয়ে থাকুক, সঠিক রাস্তা কিন্তু আপনাদের আবার চিনে নিতে হবে। একজন ঠকিয়েছে, দশজন ঠকিয়েছে, পঞ্চাশজন ঠকিয়েছে বলে কোনদিন আর কিছু হবে না— মানুষের ইতিহাস এভাবে শেষ হয়ে যায় না। মানুষ আবার লড়বে, আবার ভাববে, আবার চিন্তা করবে। সঠিক রাস্তা একদিন চিনে নেবে। তাই আমি বলি, লড়াই একটা প্রয়োজনীয় কথা, সংগঠনও একটা প্রয়োজনীয় কথা। এ দুটো বাদ দিয়ে শেষপর্যন্ত কিছুই হবে না।

কিন্তু তার আগে আর একটা বড় কথা আছে। সে কথা হচ্ছে, আদর্শ ঠিক করা, নীতি ঠিক করা, লড়াইয়ের রাস্তা ঠিক করা, লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ঠিক করা— সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে মূল রোগ কী, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

তাই এখন আমি যে কথাগুলো আপনাদের সামনে, ছাত্রবন্ধুদের সামনে বলব, সেগুলো ছাত্ররা এবং জনসাধারণ যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা ধীরভাবে ভেবে দেখবেন। আমার কথাগুলো ঠিক মনে হলে গ্রহণ করবেন, নাহলে গ্রহণ করার দরকার নেই। আর যদি বিরুদ্ধে বলতে চান, তাও বলুন, কিন্তু ঠিকভাবে বলুন। আমি বলতে চাইছি, বর্তমানে জাতির জীবনে নৈতিক অধঃপতন একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা একটা গোষ্ঠী ক্রিয়াকলাপ, শুধু এইভাবে বললে অবস্থাটাকে খাটো করে দেখা হয়। আমাদের সমস্ত জাতিটার মধ্যে নৈতিক অধঃপতন, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যাচার, লোককে ঠকানো, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কাপুরুষোচিত আক্রমণ আজ একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কি শাসক দলের, কি বিরুদ্ধ দলের রাজনীতির মধ্যে এসব ঢুকে গেছে। আমি তার থেকে আমাদের দলকেও বাদ দিতে চাই না। তবে এটুকু বলব, আমাদের দল এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার আছে। আমরা নিজেদের এসব থেকে রক্ষা করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছি। কিন্তু একথা বলি না যে, এই সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী যে বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং আবহাওয়া, তার প্রভাব থেকে আমাদের দলের সমস্ত ছেলে, সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকেরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে রয়েছে, তা তাদের একেবারে স্পর্শ করতে পারে না। বারবার এ হাওয়া এসে তাদের স্পর্শ করে, তাদের কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা করে। বারবার আমরা নিরলসভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নৈতিকভাবে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছি। কারণ, একটা কথা আমি বিশ্বাস করি এবং আপনাদেরও ভাবতে বলি, আদর্শের কথা যদি ঠিকও হয়, বড়ও হয়, সত্যও হয়, রাস্তাও যদি ঠিক বাতলাতে পারি, তবুও নৈতিক বল এবং উন্নত সাংস্কৃতিক মান ছাড়া সেই রাস্তায় এগোবার শক্তি কোনও মানুষ অর্জন করতে পারে না। একটা বড় আদর্শ, উন্নত আদর্শ এবং সমস্যা সমাধানের সঠিক রাস্তাও যদি কতকগুলো নৈতিক অধঃপতিত মানুষের হাতে পড়ে, তবে তার দ্বারা দেশের মঙ্গল হতে পারে না, আন্দোলনও সফল হতে পারে না। বরং ক্ষতি হয়। তাই আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও আদর্শ, তা শুনতে কেমন, বলতে কেমন, স্লোগান কেমন — এ তার বাইরের ঠাট-বাট। কেউ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে, বিপ্লবের কথা বলে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের

বক্তৃতা করে, কিন্তু তাদের সেই আদর্শের দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে পচে-যাওয়া অধঃপতিত নৈতিক মানকে সংযত করা যায় কি না, উন্নত করা যায় কি না, নূতন নৈতিক বলের সৃষ্টি করা যায় কি না এবং তা সৃষ্টি হচ্ছে কি না, এটাই বিচার্য বিষয়। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, শুনতে, বলতে আদর্শ যত ভালই মনে হোক, সেই আদর্শের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানের উপর। এইখানেই তার অগ্নিপরীক্ষা।

কোনও আদর্শ শুনতে এবং বলতে যত ভালই হোক, সে আদর্শের কাঠামো যত সুন্দর হোক, সেই আদর্শের প্রচার এবং প্রভাব সৃষ্টির দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে উন্নত একটা নৈতিক চেতনা, একটা নতুন মান, একটা উন্নত সাংস্কৃতিক ধারণা গড়ে না উঠলে সে আদর্শ কখনও মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। তা পরিত্যাজ্য, তা মৃত দেহের মতো পরিত্যাগ করতে হবে। একটা সুন্দর শরীর যদি মৃত ব্যক্তির হয়, আমরা তাকে ফেলে দিই। কেন? কারণ, মমতা করে তাকে জিইয়ে রাখলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তেমনি একগাদা লোক, যদি নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত ও স্লোগান সর্বস্ব হয়, দাবি তোলে, কিন্তু দায়িত্ব পালন করে না এমন হয়, তাহলে তারা সমাজের অনিষ্ট করবে। লেনিন বলেছিলেন, 'Better fewer, but better' — অর্থাৎ অল্প হোক, কিন্তু উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ চাই, কারণ তারা কিছু করবে।

পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে একবার কয়েকটি কথা বলে আমি খুব সমালোচিত হয়েছিলাম। আমি তাঁদের উদ্দেশে বলেছিলাম, 'আপনারা কি জানেন দেশটাকে? যে পঁচাত্তর শতাংশ মানুষের ভোটে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইলেকশনে লড়ালড়ি করে আপনারা যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসালেন, সেই গরিব চাষিদের, খেতমজুরদের, ভূমিহীন চাষিদের, সাধারণ শ্রমিকদের, বেকারদের অবস্থা আপনারা জানেন? তাদের অবস্থা তো আপনাদের চেয়ে অনেক খারাপ। এই সরকার তো আপনাদের। আপনারা তবু কিছু মাইনে পান। পান তো? বেকার তো নন। আমি মনে করি, জিনিসপত্রের দামের তুলনায় আপনাদের আরও মাইনে পাওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের হাতে ক্ষমতা। আপনারা তো বলবেন, সরকার প্রথম গরিব চাষিদের জন্য, শ্রমিকদের জন্য, বেকার যুবকদের জন্য কিছু করুক। তারপরে যদি কিছু টাকা থাকে, সরকারি কর্মচারীদের মাইনে বাড়াক। আর যদি তা না থাকে, তাহলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও আপনারা একত্রে লড়ে টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা না করে আপনারা বললেন, আগে আমাদের মাইনেটা বাড়িয়ে দাও, কারণ, আমরা ভোটে সরকারকে

ক্ষমতায় বসিয়েছি। ফলে সরকারের হাতে যে স্বল্প টাকা ছিল তা সরকারি কর্মচারীদের মাইনে বাড়াতেই বেরিয়ে গেল। এ কি গণতান্ত্রিক চেতনা? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা দাবি নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন, আওয়াজ তুলবেন, মানুষ মাত্রই তা সমর্থন করবেন, আজ না করলে কাল করবেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা মাথা নোয়াবেন না, প্রাণের ভয় করবেন না, খুনের ভয় করবেন না। আমি সেই আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু নিজের মাইনে বাড়াবার দাবি তোলার আগে যারা আপনাদের থেকেও দুরবস্থায় আছেন, তাদের কথা তো ভাববেন! আবার, আপনারা দাবির জন্য লড়েন বলে সরকারি অফিসে কাজ করেন না, এ চলে না। এ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণসত্তা নষ্ট হয়ে যায়, বিপ্লবী তেজ নষ্ট হয়ে যায়। সে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেশের বিপ্লব তো দুরের কথা, কোনও ভাল কাজ করতে পারে না। 'এথিক্সের' একটা বুনিয়াদি কথা হল, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে অধিকার অর্জন করা যায় না। এই আধারের ওপর দাঁড়াতে না পারলে কোনও বৃহত্তর আন্দোলন করা যায় না। নীতিহীন রাজনীতি, ওই বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায় 'নোংরা মানুষের পেশা' (profession of the scoundrel)। তো আমাদের রাজনীতিরও একটা নীতি আছে। হ্যাঁ, গান্ধীবাদীদের নীতির সঙ্গে সে নীতির মৌলিক পার্থক্য আছে। শ্রেণি সংগ্রাম, পরিবর্তনশীল জীবন সংগ্রাম, বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ থেকে এর নীতি-নৈতিকতা নির্ধারিত হয়। কিন্তু একটা নীতি-নৈতিকতা তো আছে, আদর্শবাদ আছে। কোনও নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই, সে তো চরম সুবিধাবাদ। এই যে জিনিসটা দেশে বিস্তার হচ্ছে, এতো বামপন্থীদের মধ্যেও রয়েছে। তাই দেখুন, ডাক্তারি পেশায় যাঁরা যান, ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় যাঁরা যান, তাঁরা সে পেশাগত নৈতিকতা ও মানসিকতার ধার ধারেন না। সরকারি কর্মচারী, রেলের কর্মচারী সকলে তাদের নিজ নিজ ইউনিয়নে সংগঠিত। তাঁরা দাবি নিয়ে লড়াই করেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, খুব ভাল কথা। আমাদের দলের কর্মীরা সে আন্দোলনের সঙ্গে আছে। কিন্তু তাদের 'সার্ভিস স্পিরিট' থাকবে তো! তাদের মধ্যে তো চরিত্রের একটা মান থাকবে, যা দেখে দেশের আবহাওয়া পাল্টাতে থাকবে। শোষক সম্প্রদায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — যারা এই সমাজটাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, এই নৈতিক অধঃপতন তাদের পক্ষে এক বিরাট সুবিধে।

অনেকে বলবেন, দেশে অভাব কোথায়? ঘরে ঘরে বেকার যুবকেরা সুন্দর সুন্দর প্যান্ট-জামা-ঘড়ি পরে ঘোরে, মুহুর্মুহু সিগারেট খায়। আগে লোকে এত সুন্দর জামা-কাপড় পরত না, এখন পরে। তাহলে আবার অভাব কোথায়?

একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, খবর সংগ্রহের নাম হল ইতিহাস। না, তা নয়। ঠিক তেমনই সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করা মানে তথ্য সংগ্রহ করা, আর সেগুলিকে পুঁথিতে পরপর সাজিয়ে রাখা নয়। তথ্য ও খবরগুলোকে, সমাজে যে বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংযোজিত করতে হবে। কী করে এই যুবকেরা? হয় ওয়াগন ব্রেকারের দল, না হয় অমুক পার্টির ভলান্টিয়ার হিসাবে সারাদিন তার থেকে টাকা পাচ্ছে। হয় অমুক সেবাদলের লোক হয়ে টাকা পাচ্ছে, আর নাহয় নানা অসামাজিক কাজ করে বেড়াচ্ছে। নানারকম উপায়ে রোজগার করছে এবং লক্ষ লক্ষ যুবক এইভাবে নিযুক্ত। অবাক কাণ্ড, একটা দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো এই অনৈতিক রোজগার এবং জীবনযাপনকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। সে দেশে নৈতিক মেরুদণ্ড থাকবে কী করে? থাকতে পারে না। 'নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে', বলে বক্তৃতাবাজি করলেই কি এসব দূর হবে? না, দূর হয় না।

তাহলে এসবের কারণ কী? এক কথায় বললে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা এর মূল কারণ। কিন্তু তাই বলে এটা অদৃষ্টবাদ নয়, যেন তা ঘটবেই! শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা থেকেই এসব অধোগতি আসছে। এ সমাজ যারা শাসন করছে, চালাচ্ছে, তাদের এই সমাজ থেকে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে, এর থেকে সবরকম সুবিধা ভোগ করছে, তাই তারা এটা আর পাল্টাতে চায় না। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতার সাধনার তাদের দরকার নেই, বরং এগুলিকে তারা ভয় পায়। তারা এখন 'ঐতিহ্য' 'ঐতিহ্য' করে, আর যে করে হোক, লোককে ঠকিয়ে যে ক'দিন পারে লুঠ করে যেতে চায়। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি যেটা সমাজের মধ্যে আছে, সেটার তো একটা ক্রিয়া থাকবে। সেই বিরুদ্ধ শক্তিটা যদি সঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলত এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ঠিক মতো পালন করত, তাহলে সমাজে এই যে নৈতিক অবনমন ঘটছে, তার ওপর সংযম রক্ষাকারী একটা প্রভাব পড়ত। যেমন, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। আমি বলব, এ স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার একটা ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। এ ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না, এ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, তাও আবার তথাকথিত উচ্চবর্ণের জাতীয়তাবাদ। এরকম হাজার একটা ত্রুটি স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল। সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মোসাহেবি করে একদল গোলামির মনোভাবকে বাড়িয়ে দিয়ে গেল। অন্যদিকে ছিল এদেশের পুরনো ধুঁকে পড়া সামন্তী সমাজ — ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, জাতপাত, কুসংস্কারে অন্ধ একটা সমাজ — যার মেরুদণ্ড ভেঙে

গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই জাতি, তার যুব সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবধারা, অর্থাৎ মানবতাবাদী ভাবধারা, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই চেতনা যত আধখেঁচড়া অবস্থায়ই থাকুক, তার প্রভাব যতটুকু তাদের উপর পড়েছিল, তাতে এই যুবকেরা চনমন করে জেগে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবনীশক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তারা 'কেরিয়ার' নষ্ট করে বেরিয়ে এসেছিল। তারা ফাঁসির ভয় করেনি। তারা লড়েছে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের মুক্তির জন্য। অথচ অবাক কাণ্ড, আজকাল 'আমাদের অমুক হলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে'— এটাও একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে! কারণ, তা নাহলে তাদের টুকতে অসুবিধা হবে!

স্বাধীনতা আন্দোলনের কত ত্রুটি, তা ছিল ধর্মভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন, তা হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে পারেনি, তা বিভিন্ন জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষকে একটা জাতি হিসাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। তাই আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক জাতি হলেও আজও বাঙালি, ওড়িয়া, বিহারি, তেলেগু, কানাড়ি, পাঞ্জাবি, হরিয়ানি — এইভাবে ভাগ হয়ে গেছি এবং এ এক ভীষণ ভাগ, কিছুতেই একে দূর করা যাচ্ছে না। স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর পরেও সমাজের গণতন্ত্রীকরণ বলতে যা বোঝায়, তা হয়নি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিপ্লববিরোধী আপসমুখী ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও তদানীন্তন প্রচলিত ভাবধারাগুলোর মধ্যে এবং প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল বলে তার সংস্পর্শে কুঁকড়ে যাওয়া, মেরুদণ্ড বেঁকে ঝুঁকে-পড়া জাতির যুবকরাও অমিত তেজে খাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেইসময় 'পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে' এ ধরনের অদ্ভুত দাবির কথা কেউ ভাবতে পারেনি। তাহলে সমাজে বিরুদ্ধ আদর্শে পরিচালিত আন্দোলনের শক্তির একটা ভূমিকা আছে বৈকি।

তাই কংগ্রেসি রাজনীতি ও পুঁজিবাদী শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুরনো ভাবনা-ধারণা, পরম্পরা, চিন্তা, ঐতিহ্যবাদ, জাতপাতের মানসিকতা জাতিকে যতই কূপমণ্ডুক করে তোলার চেষ্টা করুক এবং যতই অধঃপতন আনবার চেষ্টা করুক, কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের শক্তির আদর্শগত ভিত্তি যদি মজবুত থাকত, নীতি-নৈতিকতার ধারণা যদি উঁচু থাকত, শুধু বড় বড় ধার করা কথা যদি না থাকত, তাহলে তার উপর তো একটা সংযম নিশ্চয়ই থাকত। তাই আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, পশ্চিমবাংলায় যখন যুব সমাজের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের

সমর্থক প্রবল বেড়ে গেল, তখন যুবকদের নৈতিক মানের অধোগতির উপর তার তো একটা প্রভাব পড়বে। সেখানে তো একটা সংযম আসবে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, একটা বড় জিনিসের চর্চা করতে থাকলে তার প্রভাবে মানুষ খানিকটা উন্নত হয়। তা না হলে বুঝতে হবে, তাদের রাজনীতির মধ্যে কোথাও একটা বিরাট গলদ আছে। কারণ, এই রাজনীতিতে সকলে লাফাতে লাফাতে আসে, এসেই কোমর দোলাতে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল হয়, কাপুরুষের মতো আচরণ করে, হিংসা মহামারীর ঝোঁক বাড়ে, দায়িত্ববোধ চলে যায়, কর্তব্যে অবহেলা বাড়ে। এ কী কথা! তাদের সংস্পর্শে মানুষ যেমন লড়তে আসবে, তেমন কাপুরুষোচিত আচরণকে ঘৃণা করতেও তো শিখবে, তাদের রাজনীতির স্পর্শ নৈতিক অবনমনের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। কই, তা তো হচ্ছে না! তাহলে? তাহলে কোথাও একটা বিরাট গলদ আছে। সেই গলদটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি।

আমরা তার জন্য বলছি, শুধু পুঁজিবাদকে দোষ দিলে হবে না। পুঁজিবাদের এই যে অবক্ষয়, তাকে রোখবার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির যে ভূমিকা সেটাও বিচার্য বিষয়। কারণ, যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তার চরিত্র তো উদ্‌ঘাটিত। তাই সচেতনভাবে কংগ্রেসও বলে না যে, সে পুঁজিবাদের সেবা করবে। সেও লজ্জা পায় এ কথাটা খোলাখুলি বলতে। তাকেও ঘোমটার আড়াল নিয়ে বলতে হয়, সে সমাজতন্ত্র আনবে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে, পুঁজিবাদের সেবা করবে না। তো এহেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করার দরকার নেই। যদিও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শুধু ভাসাভাসা দু-একটা কথা বুঝলেও হবে না। তাকে আঘাত করে ফেলে দিতে হলে তার সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বুঝতে হবে। সে সম্পর্কেও আমি কিছু কথা বলব।

যে পুঁজিবাদী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ আজ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হঠাতে চাইছে এবং জনগণের স্বার্থের অনুকূলে একটা রাজসত্তা কায়েম হওয়া দরকার বলে মনে করছে, সেখানে যেটা দেখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে, যারা এটা করবে বলছে, তাদের রাস্তা ঠিক কি না। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, 'বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, আপনি তো সি পি আই, সি পি আই (এম) প্রভৃতি বামপন্থীদের বেশি সমালোচনা করেন।' আমি বলি, হ্যাঁ, করিই তো। করি এই কারণে যে, লড়াই কার বিরুদ্ধে করতে হবে, জনতা মোটামুটি তার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে। কিন্তু লড়াইয়ের রাস্তা কোন পথে, সেইখানে এই সমস্ত দলগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

স্বাধীনতার পর দেশে কত লড়াই হল। একদিকে লড়াইয়ে মানুষ মরছে,

কোরবানি হচ্ছে, তারপরে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? হতাশা আসছে, আর সাময়িক সেই হতাশার সুযোগে পুঁজিবাদ এবং তার শাসক দল শক্তিশালী হচ্ছে। কংগ্রেস যখন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, তখন যে বিরাট গণপ্রবাহ সারা ভারতবর্ষে এল, তাকে তারা ঠিক রাস্তায় প্রবাহিত করতে পারল না। কাজেই আন্দোলনের সামনে নেতৃত্বের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আন্দোলন করলে হবে না, শুধু বামপন্থী ঐক্য বললে হবে না। ঐক্য তো হয়, কিন্তু ঐক্য থাকে না কেন? ঐক্য কী করে থাকতে পারে? ঐক্য রাখবার জন্য সেই-ই চেষ্টা করবে, যে যথার্থ বিপ্লব চায়, পরিবর্তন চায়, লড়াইটাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তারা 'বিপ্লব বিপ্লব' খেলা করে, বিপ্লব করতে চায় না।

আমিও বিপ্লব বলি, তারাও বিপ্লব বলে, খাঁটিরাও বলে, মেকি বিপ্লবীরাও বিপ্লব বলে। সকলেই বলে, সংসদীয় রাজনীতিকে বিপ্লবের জন্য ব্যবহার করবে, তার জন্য তারা সরকারে যায়। বিচার তো করতে হবে যে, কে শুধুই বলছে, আর কে সত্যিই করছে! কে বিপ্লবটা সত্যিই মনে করে, আর কে বিপ্লবটা ভাঙিয়ে খেতে চায়! জনসাধারণের মধ্যে এই পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তো তৈরি করতে হবে।

এইগুলো বিচারের জন্য এসে যায় নেতৃত্বের প্রশ্ন। সেটা বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্ন, জনগণের আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্ন। সেটা সংসদীয় গণতন্ত্রের নেতৃত্বের প্রশ্ন নয়। কাজেই এই আন্দোলন-গুলোর সামনে এবং জনসাধারণের সামনে যারা নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে, তাদের সম্বন্ধে সমালোচনা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আমি তাদেরও বলি, আমাদের রাজনীতি সম্পর্কে সমালোচনা কর। বলি, রাজনীতি নিয়ে সমালোচনা কর, কিন্তু গালাগালি করো না। যা নয়, তা বল না। যা বলি, সেটাকে তুলে ধরে দেখিয়ে দাও, আমাদের কোথায় ভুল। যদি ভুল থাকে, মেনে নেব। যদি না মানি, আমাদের তারা পরিত্যাগ করবে, আর কোনও কথা শোনার দরকার নেই। আর আমরা তাদের রাজনীতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছি, তারা তার জবাব দিক। যদি জবাব দিতে না পারে, তাহলে তা মেনে নিক।

আর, ঐতিহ্যের কথা যদি বলা হয়, আমি তো মনে করি, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সবচেয়ে গর্ব করার মতো একটা বড় জিনিস রয়েছে। তা হল, সুদূর অতীতকাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ অনেক সময়ই জবরদস্তি নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপাত না — যেটা ইউরোপে বা অন্য দেশে এবং ধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে বহু সময় ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরকম প্রায় হয়নি। একটা মত আর একটা মতের সঙ্গে তর্ক করেছে, বিচার

করেছে। বিচারে যে পক্ষ হেরে গিয়েছে, অপর পক্ষ নির্দ্বিধায় আনন্দের সঙ্গে তাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে। শঙ্করাচার্যের কাহিনী থেকে দেখুন। শঙ্করাচার্য তখন যুবক। অন্যদিকে মণ্ডন মিশ্র বয়সে বড় এবং সেই সময় হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত সুপণ্ডিত। যখন শঙ্করাচার্য মণ্ডন মিশ্রের সাথে অদ্বৈত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেন, শঙ্করাচার্য বললেন মণ্ডন মিশ্রকে, 'আপনার স্ত্রী আদিভারতী বিচার করবেন।' সকলে বলল, উনি তো মণ্ডন মিশ্রর স্ত্রী। শঙ্করাচার্য বললেন 'তা হোক, উনি পণ্ডিত, সুবিচার করবেন।' তর্ক হল। স্ত্রী রায় দিলেন, মণ্ডন মিশ্র হেরে গেলেন। হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের অতবড় একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, যার কথায় হিন্দুসমাজ চলত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যকে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন। এই তো ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। কংগ্রেস ঐতিহ্যের কথা বলে। বহু লোক ঐতিহ্যের কথা বলে। যদি ঐতিহ্যের কথা বলে, তাহলে রাস্তা ঠিক কি ভুল, তা নিয়ে যুক্তিবাদী আলোচনা হোক। যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, গ্রহণ কর। আর, তা না করলে বুঝতে হবে, ভারতীয় ঐতিহ্য বলাটা একটা চালাকি মাত্র, একটা ভাঁওতা মাত্র। ভারতের গৌরব করার ঐতিহ্য আর কী আছে? আমি দেখি, সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস গৌরব করার মতো ছিল। তারপর থেকে একটা যুগ অন্ধকার। আর একটা অধ্যায় রামমোহন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের গর্ব করার, যেটা চলে গিয়েছে। আবার অন্ধকার। এই তো ভারতবর্ষ! তাহলে ভারতীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে এই মানসিকতাই তো প্রতিফলিত করতে হবে। কই সেই মানসিকতা? কাজেই এসব বক্তৃতা থাক। তারা কেউ ভারতীয় পরম্পরা-টরম্পরা নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঐতিহ্য নিয়েও ঘামায় না। আর তাদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিও অনেকেরই সমান। কাজেই ওসব বড় বড় কথা থাক। আসল কথা হচ্ছে, একদিকে মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্যদিকে দেশপ্রেম — একটা সমাজে যেটা থাকে, তার উপরে কাজ করে তারা প্রগতির গলা টিপে ধরতে চাইছে।

এই নৈতিক-সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মূল জায়গায় যেতে হলে তিনটি প্রধান সমস্যা বুঝতে হবে। একটি হল ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। পরিকল্পনা যত একটার পর একটা হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা তত দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। উটকো পণ্ডিতেরা বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। না, বেকার সমস্যা বৃদ্ধির কারণটি এত সহজ এবং সরল নয়। দ্বিতীয় হচ্ছে, কৃষির আধুনিকীকরণ এবং যন্ত্রীকরণের সমস্যা। একটা কথা আমি আপনাদের বলতে চাই, তা হচ্ছে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আপনারা সকলেই জানেন, দেশের

এই বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন লোক গ্রামে বাস করে। আর এই গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ লোক প্রায় সর্বহারা, অর্ধসর্বহারা স্তরে নেমে এসেছে। একটা রক্ষণশীল হিসাব আপনাদের সামনে দেব — যেটার বিরোধিতা করার উপায় কারোর নেই। তাহল, সারা ভারতবর্ষের গড় হিসাবে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা একান্ন থেকে তিপ্পান্ন ভাগ পর্যন্ত খেতমজুর বা ভূমিহীন চাষির সংখ্যা। দ্বিতীয় হচ্ছে, তিন-পাঁচ-দশ বিঘা যাদের জমি, তাদের আমরা গরিব চাষি বলি। বিভিন্ন রাজ্যে এক্ষেত্রে একটু পার্থক্য হয়। তাহলে, খেতমজুর তিপ্পান্ন শতাংশ এবং গরিব চাষির সংখ্যা যদি তেরো শতাংশ বা চোদ্দো শতাংশ হয়, তাহলে যোগফল দাঁড়াচ্ছে ছেষট্টি শতাংশ থেকে সাতষট্টি শতাংশ, যারা প্রায় সর্বহারা। একটি পরিবারে তিন বিঘা জমি দিয়ে কী হতে পারে, তা আপনারা সকলেই বোঝেন। আজকালকার দিনে এই জমি কিছুই নয়, তাতে চাষও তেমন হয় না।

তারপরে বাকি পনের শতাংশ গ্রামীণ মানুষের সেচ-অসেচ মিলিয়ে তিন বিঘা থেকে ওপরে দশ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে। একটি পরিবারে এমনকী পনের বিঘা অসেচ জমি হলে তা দিয়ে আজকালকার দিনে কতটুকু হয়। যদি একটু ন্যূনতম খেয়েপরে ছেলেমেয়েদের ভদ্রভাবে মানুষ করতে হয়, একটু লেখাপড়াও শেখাতে হয়, তা কি ওই জমির জোরে করা সম্ভব? আর যে পরিবারে খাওয়ার লোক বেশি — হাজার পরিবার পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও গ্রামের কোনও পরিবারেই পাঁচ থেকে ছয় জনের কম নেই, বরং বেশিই রয়েছে — তারা কী করবে? তাদের কোনও কেনবার ক্ষমতা নেই। তাহলে সাতষট্টি শতাংশ, আর পনের শতাংশ মিলে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার বিরাশি শতাংশ মানুষের কেনবারই কোনও ক্ষমতা নেই এদেশে। তারা কোনও মতে দিন গুজরায়। আর এই যে বললাম, পনেরো শতাংশ থেকে তিপ্পান্ন শতাংশ সেই জনসংখ্যার মধ্যে যারা খেতমজুর, তারা সারা বছরের জন্য কাজে নিযুক্ত থাকে, অথবা একখণ্ড জমি দিয়েছে, সেইটা নিয়ে তারা সারা বছরের জন্য আছে। এরকম ভাবে যুক্ত কাজের লোকের সংখ্যা বত্রিশ শতাংশর থেকে বেশি নয়। বাকি সব অসংগঠিত শ্রমিক। তারা কী কাজ করে? কোথায় কাজ করে? কখনও ফসল বোনার সময়, কখনও ফসল কাটার সময় জমিতে কাজ করে। বাকি সময় ঘরের চাল তৈরির কাজ করে, কুলিগিরি করে, মাটি কাটার কাজ করে, ইটভাটায় কাজ করে। এইভাবে তারা জীবনযাপন করে। আর, অর্থনীতি শাস্ত্র অনুযায়ী একটা দেশকে উন্নত, অনুন্নত, কি উন্নয়নশীল দেশ বলা হয় কীসের ভিত্তিতে? বলা হয়, কোন দেশে শিল্প অর্থনীতিতে কত লোক নিয়োজিত এবং কোন দেশে কৃষি

অর্থনীতিতে কত লোক নিয়োজিত তার ভিত্তিতে। যে দেশে কৃষি অর্থনীতিতে বেশিরভাগ লোক নিয়োজিত থাকে, তাকে পিছিয়ে-পড়া, অনুন্নত দেশ বলে। যে দেশে শিল্পে বেশিরভাগ লোক নিয়োজিত থাকে, তাকে উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ বলে। তা ভারতবর্ষকে নাকি উন্নয়নশীল দেশ করার চেষ্টা হচ্ছে।

অথচ, ভারতবর্ষের শাসকদলের ভূমি সংস্কারের নীতিটি আলোচনা করুন। দেখবেন, সেটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা — যে পরিকল্পনায় তারা কৃষিতে ব্যাপকভাবে যন্ত্রীকরণ এবং বৈজ্ঞানিকীকরণ করতে চাইছে না। অথচ এটা না করলে, কৃষি অর্থনীতির উন্নতি হতে পারে না, গ্রামে বিজলি যেতে পারে না, গ্রামীণ মানুষের আর্থিক জীবন উন্নত হতে পারে না। কিন্তু তারা তা করছে না এই কারণে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এখনই যেখানে গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন বেকার হয়ে শহরের দিকে কাজ পাবার জন্য ছুটে যাচ্ছে, তখন যদি তারা সর্বত্র ব্যাপক মেশিন-ট্রাকটার ও অন্যান্য আধুনিক উপায় ব্যবহার করে কৃষিকাজ শুরু করে, তাহলে এক ধাক্কায় কোটি কোটি গ্রামীণ মানুষ বেকার হয়ে যাবে। সেই মানুষগুলোকে তারা কাজ দেবে কোথায়? তাই বেকার সমস্যার চাপ থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য টোটকা, কবিরাজি চলছে। তাইচুং চাষ করে, আই-আর এইট চাষ করে, খণ্ড খণ্ড জমিতে কত রকমের ম্যাজিক করে, হাকিমি-কবিরাজি করে ভেলকি দেখিয়ে ফসল বেশি ফলানো যায়, তার চেষ্টা চলছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষকে টুকরো টুকরো জমিতে আটকে রাখবার জন্য যারা ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা করছে, তারা আবার সাথে সাথে বলছে, তারা উন্নয়নশীল দেশ হতে চায়। সকলেই জানে, ইউরোপ-আমেরিকার একজন শ্রমিক আলাদা স্নান করার জায়গা, আলাদা খাওয়ার জায়গা, ঘরে পর্দা, টেবিল না থাকাকে মনুষ্যেতর জীবন বলে মনে করে। আর, আমাদের দেশে যদি একটা ঝুপড়ি জোটে, একটি মেয়ে মানুষ সংগ্রহ করতে পারে, আর দু'বেলা পান্তা ভাত খায়, তাহলে আমাদের দেশের মানুষ মনে করে, চাষিও মনে করে, মহা সুখে আছে। তার আর এত ঝঞ্ঝাটের দরকার কী? হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে বসে গেল সে। কিন্তু আমেরিকার একজন শ্রমিক এটা চিন্তাই করতে পারে না। এখানে যেমন পান্তা ভাতটি, ঝুপড়িটি না হলে মানুষ মনে করে তার অভাব, তেমনি আমেরিকার শ্রমিক মনে করে, তার স্নান ঘরে শুয়ে স্নান করার জায়গা, দু'খানা চেয়ার, একটু আলাদা খাওয়ার জায়গা, আর একটু পোশাক পরার ঘরের আলাদা ব্যবস্থা না থাকলে তারও ওই পান্তা ভাত না-জোটার মতন অভাব। ফলে সে বারুদের মতো ফেটে পড়বে। সে মনে করবে, সে মনুষ্যেতর জীবনে আছে।

এটা আমি ব্যাখ্যা করলাম এইজন্য যে, অভাব নিয়ে তুলনায় যেন আবার

ভুল ধারণা তৈরি না হয়। অর্থাৎ বলা ভাল, আমেরিকা, জাপানে শ্রমিকরা এত টাকা মাইনে পায়, তারা এত ভাল আছে, কাজেই তাদের তো অভাব আমাদের মত নয়, যেন এরকম গোলমাল না হয়। আসল কথা, তাদের দেশেও অভাববোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রয়োজনবোধ বাড়ছে। কাজেই যেটা এদেশের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনবোধ, তার মাপকাঠিতে সে যা পাবে, এই সব দেশের সমাজজীবনে ন্যূনতম প্রয়োজনবোধ তা নয়। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনবোধ যা, তার মাপকাঠিতে সেখানেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রতিদিন কমছে পুঁজিবাদী শোষণের জন্য। আর তার ফলে পুঁজিবাদী বাজারের কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখার জন্য তাদের অর্থনীতির সামরিকীকরণ করার দরকার হচ্ছে। সামরিকীকরণ, যাকে আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা এবং আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট থাকার সময় বললেন যে, তাদের শাসনের ভিত হচ্ছে শিল্পের সামরিকীকরণ বা মিলিটারাইজেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠে সেই সুর শুনতে পাই। ভারতবর্ষ তো আমেরিকার মতো প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজ নয়। এখানে তো অর্থনৈতিক বিকাশের কত জিনিসই বাকি রয়ে গিয়েছে। তবু ভারতে প্রতিবছর প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হচ্ছে। পার্লামেন্টে বামপন্থীরা ভিড় করে আছে। আসলে সব শোভা! পার্লামেন্টের নানা বডিতে — অর্থাৎ, অমুক দপ্তরে সি পি আই, তমুক দপ্তরে সি পি এম, তমুক দপ্তরে সোস্যালিস্টরা আছেন — তবুও কেউ প্রশ্ন করে না যে, যারা দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না, শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারে না, যেখানে অর্ধাহারে-অনাহারে বেশিরভাগ মানুষ বাস করে, সেখানে প্রতিবছর মিলিটারি বাজেট বাড়বে কেন? এতে তাদের লজ্জা না হলেও, আমাদের হয়। ছাব্বিশ বছর স্বাধীনতার পরেও মানুষ রাস্তায় জানোয়ারের মতো জীবনযাপন করে, এতে গর্বের কিছু নাই। মানুষের এই জানোয়ারের মতো জীবনযাপন করার জন্য সভ্যতা গড়ে ওঠেনি, তার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাও মানুষ করছে না, করছে মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্যই।

এমন একটি অভাবগ্রস্ত দেশ, যেখানে 'ছ-আনা' একটা লোকের গড় রোজগার, সে দেশে দিনের পর দিন মিলিটারি বাজেট বাড়াতে হয়। যদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলত যে— 'কী করব অভাবগ্রস্ত দেশ, কিন্তু শত্রু আমাদের আক্রমণ করছে। দেশকে রক্ষা করতে হবে এবং তার জন্য দরকার হলে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি, ত্যাগ স্বীকার করে না খেয়ে থেকেও এই অপচয়টা না করে উপায় নেই,' — তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু, তিনি উত্তর করলেন কী? উত্তরটি লক্ষ করুন। তিনি বললেন, 'প্রতিরক্ষা শিল্প, মিলিটারি বাজেট আমাদের

দেশের অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' মানে কী? সরকার দেশের জনগণের বাজেটের টাকায় সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করবে, নিজেই আবার খরিদ্দার হয়ে তা কিনবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলোতে সরকার যদি সাবসিডি না দেয়, সেখান থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালপত্র না কেনে, তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলো লালবাতি জ্বালবে। কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সরকার নিজেই অর্ডার দেয়, নিজেই কেনে। তাই মিলিটারি খাতে নানা খরচ দিনের পর দিন বাড়াতে হচ্ছে। এটা সম্পর্কে পাছে জনসাধারণের চোখ খুলে যায়, তার জন্য মাঝে মাঝে 'দেশ বিপন্ন' বলে চিৎকার করতে হচ্ছে।

আসল বিষয় হচ্ছে, দেশে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট চলছে, যে সংকটের ফলে গ্রামের বিরাশি শতাংশ মানুষ অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন — যাদের কেনবার কোনও ক্ষমতা নেই। তাহলে বাজার সম্প্রসারণ হবে কীভাবে? শহরে যে হারে বেকারের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদেরও কেনবার ক্ষমতা নেই। চাকুরিজীবীদের টাকার অঙ্কে হয়তো মাইনে বেড়েছে, কিন্তু মূল্যসূচক যে অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, জিনিসপত্রের দাম যে অনুপাতে বেড়েছে, সেটা হিসেব করলে আসল আয় কমে গিয়েছে। ফলে আগে মজুরদের কম মাইনে সত্ত্বেও যে ক্রয়ক্ষমতা ছিল, এখন বেশি মাইনে পেয়েও সে ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। শুধু ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বড় বড় ব্যবসাদারদের, সরকারি অফিসারদের, আমলাদের, মিলিটারি অফিসারদের, আর রাজনৈতিক দলের নেতাদের এবং ওয়াগন ব্রেকার দলের যুবকদের। আর কি কারও ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে? তাহলে এমন দেশে পুঁজিবাদী বাজার সম্প্রসারণ হবে কী করে? পুঁজির বিনিয়োগ হবে কী করে?

তারা বলছে, শিল্প বিকাশ যতটা হচ্ছে, তার বেশি আর হতে পারছে না পুঁজির অভাবে। কারণ পুঁজি নেই, পুঁজি অল্প। তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। হ্যাঁ, একথা সত্য বলে মেনে নিতাম, যদি দেখতাম, অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে শিল্পে যে পুঁজি তৈরি হচ্ছে, কৃষি অর্থনীতি থেকে যে পুঁজি তৈরি হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যে পুঁজি তৈরি হচ্ছে, সেই পুঁজি তারা দেশের শিল্পে বিনিয়োগ করছে। এক্ষেত্রে তাদের কোনও উদ্যোগ আছে কি? নাকি পুঁজি জমে থাকছে? জমে থাকা, পড়ে থাকা পুঁজি বিনিয়োগ করার পর যদি পুঁজির সঙ্কুলান না হত, তখন বুঝতাম, পুঁজির সত্যিই প্রয়োজন। কিন্তু কথাটা অসত্য, মিথ্যা। একদিকে ভিক্ষুক বানাচ্ছে দেশকে, আর একদিকে মিথ্যা কথা বলছে। কেননা দেশের অভ্যন্তরে যতটুকু পুঁজি তৈরি হচ্ছে, দেশের শিল্প-কারখানায় তার ব্যবহার হচ্ছে না। সেটা জমে থাকছে। কেন? এটা দ্বিতীয় প্রশ্ন।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তারা বলছে, শিল্পে অশান্তির জন্য, ধর্মঘটের জন্য উৎপাদন কম হয়। তাদের কথাটা না হয় যুক্তির খাতিরে মানব। কিন্তু, যখন ধর্মঘট হয় না, যখন শিল্পে শান্তি থাকে —তখনও দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেলায়, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোতে এবং বিভিন্ন সংস্থায় যে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, সে যতটুকু উৎপাদন করতে পারে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় কি? শিল্পে শান্তির সময়েও তা হয় না। শিল্প-কারখানাগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতার কেন সদ্ব্যবহার হয় না? তখন তো ধর্মঘট করে মজুররা বসে থাকছে না। তাহলে কীসের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বসে থাকছে? না, মাল তৈরি করলে কিনবে কে? বিক্রি না হলে মাল জমে যাবে, লে-অফ হবে। লে-অফ হয় কী করে? যখন কোনও একটা উন্নতিশীল দেশ শিল্পোদ্যোগের পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন তো সে ক্রমাগত শিল্প গড়ে তুলবে। এ রাস্তা যদি খোলা থাকে, তাহলে কোনওদিন সে দেশে লে-অফ হয় না। সে দেশে তো আরও মজুর দরকার। সে দেশে তো আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগালে লে-অফের তো কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। অথচ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর উৎপাদন না হওয়ার দায়দায়িত্ব তারা চাপিয়ে দেয়। মূর্খ কাকে বলে? মূর্খের অশেষ দোষ। সে মূর্খ রাজনীতিকই হোক, আর সে মূর্খতা জনতাকেই গ্রাস করুক — সবই সমান। তার ফলভোগ জাতিকে করতেই হবে, দেশকে করতেই হবে।

তাহলে আসল কথাটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে? শিল্প বিকাশ যে হচ্ছে না, তার কারণ তো পুঁজির অভাব নয়। তার কারণ, বাজার সংকোচন। বাজার সংকোচন হচ্ছে কেন? কারণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে। কেন কমছে? কারণ, গ্রামের বেশিরভাগ লোক অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন হয়ে রয়েছে। কেন রয়েছে? কারণ, কৃষির আধুনিকীকরণ হয়নি এবং ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত গ্রামীণ মজুরকে সারা বছর কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। তাহলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে? কী করে বাজার সম্প্রসারণ হবে? আর বাজার সম্প্রসারণ না হলে পুঁজির বিনিয়োগের উদ্যোগ আসবে কোথা থেকে? আর এগুলি যে হচ্ছে না, তার কারণ কী?

এসবের কারণ হল, পুঁজিবাদী সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন, যেটা আজ সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না বলে বাজার সংকোচন করে সে আজ বেকারের জন্ম দিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গ্রামেও আর কোনও শিল্পায়নের রাস্তা খোলা নেই। তা এই হ'ল পুঁজিবাদ, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন, আর সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন।

পুঁজিবাদ মানে, যেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এখানে উৎপাদনের মূল নিয়ম এবং নীতি হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ। এখানে মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদন হয় না, লাভের দিকে লক্ষ রেখেই উৎপাদন হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিপরীত থাকে। সেখানে সর্বোচ্চ মুনাফা নয়, জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা সর্বোচ্চ পূরণের লক্ষ্যেই উৎপাদন হয়। সেখানেও উদ্বৃত্ত মূল্য বা সারপ্লাস ভ্যালু তৈরি হয় শ্রমিকদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ দেশে নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্য, যন্ত্র মেরামতির জন্য লাভের একটা অংশ নেওয়া হয়, আর একটা অংশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা এবং মানুষের উন্নতির জন্য রাস্তা, শিক্ষা, হাসপাতাল প্রভৃতি খাতে ট্যাক্সের রূপে নিয়ে বাকি সম্পূর্ণটা মজুরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে মজুরকে ন্যায্য মজুরি দেওয়া হল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কী হয়? সেখানে হচ্ছে, লাভটা কারখানার স্থায়ী সম্পত্তির প্রয়োজনে একটা অংশ, রাষ্ট্রকে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য একটা অংশ, শেয়ার-হোল্ডারদের জন্য বিরাট অংশ, আর ডাইরেক্টর, বোর্ড মেম্বার, চেয়ারম্যানদের ঘোরা-ফেরার খরচের নামে, আমলা পোষার নামে ইত্যাদি নানা খাতে লাভের সিংহভাগটি মালিকশ্রেণির পকেটে চলে যায়। ফলে মজুর ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এইভাবে মজুররা শোষিত হচ্ছে। মজুর, যারা সমাজের বেশিরভাগ মানুষ, তারা যদি ক্রমাগত ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে কী করে? তাই বাজার সংকুচিত হচ্ছে। কলকারখানা কিছু কিছু হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পুরনো বহু কলকারখানায় লালবাতি জ্বলছে।

তাই সেই ১৯৪৯ সাল থেকে আমি চিৎকার করে আসছি। তা হচ্ছে, তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে ঠিকই, কিন্তু তাকে সবসময় একটা সংকট অনুসরণ করে চলেছে। তার কারণ পুঁজিবাদ তার প্রগতির চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাহলে দেখছেন যে, শিল্পবিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এবং যতটুকু পুঁজি তৈরি হচ্ছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত করার সামাজিক উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। সমাজতন্ত্রে মালিক-মজুর সম্পর্ক দূর করা সম্ভব বলেই একমাত্র তখনই সামাজিক লক্ষ্যে উৎপাদন নির্ধারণ করা সম্ভব এবং উৎপাদন থেকে যা লাভ হবে, সেই লাভ থেকে সমাজকল্যাণের অংশটি ছাড়া বাকিটি মজুরকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। আর বিপ্লব করতে পারলে শিল্পবিকাশের দরজা খুলে যাবে, কৃষিতে আধুনিকীকরণ হবে। আর কৃষিতে আধুনিকীকরণ হলে

কৃষিক্ষেত্রের সহযোগী শিল্পগুলো গড়ে উঠবে এবং তাতে গ্রামে বেকারদের একটা বিরাট অংশকে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে।

তাই তিনটি যে মূল সমস্যা, অর্থাৎ বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষির যন্ত্রীকরণ এবং আধুনিকীকরণ, আর শিল্পবিকাশ — তার জন্য মূল প্রয়োজন হল, শিল্পে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা, যেটা পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎখাতের প্রশ্নটির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উৎপাদনকে পুঁজিবাদী সম্পর্ক থেকে মুক্ত করতে না পারলে, দিনের পর দিন বাজারে কৃত্রিম উপায়ে তেজিভাব সৃষ্টি করলেও, সাময়িকভাবে বাজার স্ফীত হলেও, বাজার সংকুচিত হবে, শিল্প রুদ্ধ হবার প্রবণতা দেখা দেবেই। শিল্পের বিকাশ হবে না। সংকট দেখা দেবেই। আর নৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংকট প্রতিফলিত হবে।

হিটলারি কায়দায় টোটকা দ্বারা দেশকে অগ্রসর করার নামে, উন্নত করার নামে এমন ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা তারা নিচ্ছে, যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোক টুকরো টুকরো জমিতেই আটকে থাকবে। এটা তারা করছে, গ্রামীণ বেকাররা যাতে শহরে না আসতে পারে, যাতে অল্প অল্প জমি দিয়ে অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন অবস্থায় গ্রামের জমিতে তাদের আটকে রাখা যায়, আর তার দ্বারা বেকার সমস্যার ধমকি থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়। জাপানও তাই করছে। তাই ওই সমাজতন্ত্রীদের বলেছিলাম, জাপানের সমস্যা হল পুঁজিবাদকে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ধমকি থেকে রক্ষা করা, আর তার দ্বারা ওদের দেশের পুঁজিবাদ যে ক্ষয়িষ্ণু নয়, উন্নতিই করছে, তা দেশের জনগণকে দেখানো। তা সত্ত্বেও বেকার সমস্যার ধমকি মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করছে। এই ধমকি আমেরিকাতেও বাড়ছে, জাপানেও বাড়ছে। সেটা যাতে বেশি না বাড়ে, তার জন্য সকলেই ভাবছে, গ্রামের মধ্যে কত লোককে আটকে রাখা যায়।

তাহলে পুঁজিবাদকে তার সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দালালদের দাওয়াই হচ্ছে, 'জাপানি প্রথায় চাষ'। অথচ, তারা তো সমাজবাদী, তারা তো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, তারা তো কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, তারা তো সমাজতন্ত্রের কথা বলে, তারা কি পুঁজিবাদকে বেকার সমস্যার ধমকি থেকে কী করে রক্ষা করা যায়, সে যাতে বেকারের চাপে ভেঙে পড়ে বিপ্লব না ঘটাতে পারে, তার জন্য ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা দেবে? তাহলে পুঁজিপতিদের দলে তারা নাম লেখাক। তাদের সমাজবাদের কথা বলার দরকার কী? জাপানি প্রথায় চাষ জাপান করছে পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্য। এখানে যারা পুঁজিবাদের চর্চা করছে, যারা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে চায়, তারাও বলছে, মেশিন-ট্রাকটার

আসুক, কিছু কিছু আসুক, দশ শতাংশ আসুক, কিন্তু বেশি আসতে দেবে না। লালবাহাদুর শাস্ত্রী* নাগপুরেই বলেছিলেন, 'আমাদের কি এত বোকা পেয়েছ যে, সর্বত্র মেশিন-ট্রাকটার দিয়ে চাষ করব?' ফলে তারা অত বোকা নয়। এমনি বেকারি সামাল দিতে পারছে না, তারপরে কোটি কোটি লোক এক ধাক্কায় বেকার হয়ে গেলে তার চাপ কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা সামাল দিতে পারে না। তাই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট থেকে পুঁজিবাদকে টোটকা, কবিরাজি, হেকিমি করে তিনি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আর, এইসব তথাকথিত সমাজতন্ত্রী সি পি আই, সি পি আই(এম-এর কর্মসূচিতেও দেখছি, তারা মনে করে, গ্রামের মধ্যে মেশিন-ট্রাক্টর আনার দরকার নেই। আমি বলি, পুঁজিবাদ ব্যাপক মেশিন-ট্রাক্টর-যন্ত্রপাতি আনতে পারবে না, কিন্তু সেজন্য চাষিকে কি ওটাই বোঝাতে হবে যে, এই জমিতে অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত অবস্থায় জীবনভোর তাকে কাটাতে হবে। চাষির বোঝা দরকার, মেশিন-ট্রাক্টর তার শত্রু নয়, পুঁজিবাদ তার শত্রু। পুঁজিবাদের জন্য মেশিন-ট্রাক্টর আনা যায় না। কারণ, তার বিকল্প চাকরির বন্দোবস্ত নেই, সে বেকার হয়ে যাবে। তাই সে যদি মেশিন-ট্রাক্টর চালু করার বিরুদ্ধে কোথাও লড়ে, তাহলে এইজন্যই লড়বে যে, সে মেশিন-ট্রাক্টরের বিরোধী নয়, সে আনতে চায়। সেজন্য তাকে বিকল্প কাজ দিক, নাহলে সে মেশিন-ট্রাক্টর আনতে দেবে না। আসলে সে নিজেই তো মেশিন-ট্রাক্টর চায়। সে তার জন্য পুঁজিবাদকে হটাতে চায়। পুঁজিবাদ হটলে মেশিন-ট্রাক্টর দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ হবে। তবে গ্রামে রোশনি আসবে, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি হবে, পশুর অবস্থা থেকে তারা উঠে দাঁড়াবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বাজার সম্প্রসারণ হবে। তবেই শিল্পবিপ্লব বা শিল্পের অগ্রগতি এবং উন্নতির পথ সুগম হবে।

অনেক লোক এমন কথাও ভাবে, হ্যাঁ, কংগ্রেসও তো সমাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তা আলাদা এটুকুই যা পার্থক্য! আরে বাবা! বিজ্ঞানে তো সত্য একটাই। এ দেশের পরম্পরায় আর কুসংস্কারে কোটি মানুষের কোটি সত্য, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু বিজ্ঞানে তো সত্য একটাই। সে জাপানি বৈজ্ঞানিকদের জন্যও ইলেক্ট্রিসিটির তত্ত্ব যা, ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকদের জন্যও ইলেক্ট্রিসিটির তত্ত্ব তাই। ভারতীয় পরম্পরার জন্য ইলেক্ট্রিসিটির তত্ত্বটা এখানে একরকম, আর জাপানি পরম্পরার জন্য তার তত্ত্বটি আর একরকম, তা হয় না। কারণ, বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কারবার করে। তাই সে জানে সত্য এক, সত্য বিশেষ এবং আপেক্ষিক। অথচ ভাবা হচ্ছে,

* ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের রাস্তা সব আলাদা, একরকম নয়। আলাদা রাস্তা মানে ওই তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো রাস্তা। মানে যেটা কোনও রাস্তাই নয়, যেটা গোলকধাঁধাঁ। আর, রাস্তা যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে সকল দেশেরই বিপ্লবেরও একটিই রাস্তা। কিন্তু সেই রাস্তাটি আমরা পেয়েছি কি না, আমরা যা বলছি সেটাই ঠিক কি না, এটি একটি প্রশ্ন হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে, তর্কাতর্কিও হতে পারে, আদর্শগত যুদ্ধ হতে পারে। হাতাহাতি যুদ্ধ নয়, আদর্শগত যুদ্ধ— অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ইতিহাসের বিচার, তাতে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাস্তা যদি আমরা না দেখতে পেয়ে থাকি, কোথাও ভুল থাকে, ধরা পড়বে এই পথে। কিন্তু রাস্তা একটা। নানা মুনির নানা মত, নানা রাস্তা—সে ওই ধর্মশাস্ত্রে চলে, বিজ্ঞানের জগতে চলে না। আর, বিপ্লব তো একটা বিজ্ঞানের কারবার। সমাজ প্রগতির প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করা একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়। অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো একটি বৈজ্ঞানিক কারবার। এটা ধর্মীয় কুসংস্কার নাড়াচাড়া করার কারবারই নয় যে, নানা মুনির নানা মত হবে। মত নানা হতে পারে, কিন্তু সত্য মত একটাই। ইতিহাস-বিজ্ঞানের দ্বারা সেটা নির্ধারিত। সেই পথটি ঠিক যদি না হয়, সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত কোরবানি বারবার মিথ্যা হয়ে যাবে। হোক স্লোগান সমাজতন্ত্র, হোক ঘোষিত নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তাতে রাস্তা ঠিক একথা প্রমাণ হয়ে যায় না। ভুল রাস্তায় পরাজয় বারবার আসবে। বারবার আন্দোলন মার খাবে। বারবার হতাশা গ্রাস করবে, বারবার মানুষ উল্টোপাল্টা বলতে থাকবে — একথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু তাতে সব শেষ হবে না। আবার মানুষ লড়বে, আবার মার খেতে হবে। আবার লড়বে, রাস্তা যতক্ষণ না পাওয়া যায়। শক্তি সঞ্চয় করলেও জিততে পারা যাবে না। ভুল রাস্তায় জেতা যায় না। যেমন, একজন মানুষের খুব সাধনা, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু টিনচার আয়োডিন কী দিয়ে বানাতে হয়, সেটি সম্বন্ধে তার একটি মনগড়া ধারণা । তিনি মনে করেন, মহানদী থেকে কিছু বালি আর তার সাথে কিছু মাটি-চুন-সুরকি মেশালে এবং তার সঙ্গে কিছুটা গাছ-গাছড়ার রস মেশালে টিনচার আয়োডিন তৈরি হবে। কারণ, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলে এতেই হবে। ত্যাগ থাকলে এতেই হবে। আমি বলি, তিনি ত্যাগ করে, উপোস করে হাড় জিরজিরে হয়ে মরে যেতে পারেন, তার দ্বারা তার সততার এবং নিষ্ঠার প্রমাণ হবে। কিন্তু টিনচার আয়োডিন তিনি কোনওদিন বানাতে পারবেন না। টিনচার আয়োডিন সেই বৈজ্ঞানিক বানাবেন, যিনি জানেন কী কী উপাদান এবং রাসায়নিক বস্তু দিয়ে টিনচার আয়োডিন তৈরি করতে হয়। যে বৈজ্ঞানিক সেটি জানেন এবং যাঁর সেগুলো

সংগ্রহ হয়ে গেল এবং সংযোজিত করার প্রক্রিয়া জানা হয়ে গেল, তিনি টিনচার আয়োডিন তৈরি করতে পারবেন। সমাজ নিয়ে কারবারের ক্ষেত্রটা, বিপ্লব নিয়ে লড়ালড়ির ক্ষেত্রটাও এইরকমই। পরীক্ষাগারের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাটা নেই বলে এখানে মনমাফিক সব করা যায়, তা নয়। এখানেও এই পর্যবেক্ষণ এবং সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতিতে রাস্তা, নীতি ঠিক করতে হয়।

যদি ভারতবর্ষের ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয়, তাহলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। এ শুধু পুঁজিবাদই নয়, এ একচেটে পুঁজিবাদ এবং তা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে গেছে। অর্থনীতিবিদদের জানা দরকার, পুঁজি রপ্তানি আর পণ্য রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য কী। পণ্য রপ্তানি সকলেই করে, সকল দেশকেই করতে হয়। সব পুঁজিবাদী দেশ করে। কিন্তু পণ্য রপ্তানির দ্বারা কোনও পুঁজিবাদী দেশ তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যবাদী হয় না। কারণ, এর দ্বারা অপর দেশের বাজার শোষণ করা হয় মাত্র। কিন্তু পুঁজি রপ্তানি দ্বারা সেই দেশের সস্তার কাঁচামাল শোষণ করা হয় এবং সে দেশের সস্তা শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে লুণ্ঠন করা হয়, যাকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বলে। যেমন আমাদের দেশে বিদেশি পুঁজি খাটলে আমরা মনে করি না যে, জাতীয় উন্নতির জন্য সে কাজ করছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে মনে করি, দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করে এবং দেশের সস্তা শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে এদেশের ধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। এটা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। তাই অনেক সময়ই দাবি ওঠে, বিদেশি পুঁজি নিয়োগ করতে দেওয়াই চলবে না। বা, যদি করতে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা রাষ্ট্রীয়করণ কর, বাজেয়াপ্ত কর। কেন? না, এ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি। তাহলে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যখন পুঁজি রপ্তানি করে? হাজার হাজার কোটি টাকার উপরে ভারতবর্ষের পুঁজি যখন বিদেশের বাজারে খাটে? সেগুলো কি গান্ধী আশ্রমের কম্বল বিক্রি করে নাকি? এগুলো কী করে? তারা বিদেশ থেকে যে ধনসম্পদ লুটে নিয়ে আসছে এবং যে পুঁজি তৈরি হচ্ছে, তার দ্বারা এদেশের বেকারি, দুর্দশা কি হু হু করে কমে যাচ্ছে? শিল্পোদ্যোগ হচ্ছে? নাকি, এদেশের পুঁজিপতিদের পেট মোটা হচ্ছে, যেমন করে বিদেশের ধনকুবেরদের হচ্ছে বাইরে থেকে লুঠ করে। তাহলে ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদ খারাপ, কিন্তু ভারতীয় পরম্পরাসম্মত সাম্রাজ্যবাদ খুব ভাল— এটা কি ম্যাজিক?

ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে। হতে পারে আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তুলনায় ভারতবর্ষ দুর্বল, কিন্তু একচেটে পুঁজিবাদ আসার পরে ব্যাংক পুঁজি এবং শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ আসার পরপরই ব্যাংক পুঁজি আর

শিল্পপুঁজির মিলন হয়নি, হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথমে দুটো ক্ষেত্রে দুটো আলাদা পুঁজিপতি গোষ্ঠী ছিল। একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে, বিরোধিতাও করেছে। কিন্তু একচেটে পুঁজির জন্ম হওয়ার পর এই ব্যাংক পুঁজি আর শিল্পপুঁজির মিলন ঘটেছে ভারতবর্ষে। ফলে একই ধনকুবের গোষ্ঠী ব্যাংকপুঁজি আর শিল্পপুঁজিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এই নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে গোটা দেশের বাজার, কৃষি; শিল্পজাত দ্রব্য সহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্র প্রভাবিত করছে মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠী — যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি, 'ফিনানসিয়াল অলিগার্কি' এবং সে পুঁজির রপ্তানি করছে। তাহলে ভারতবর্ষ তো শুধু পুঁজিবাদী দেশ নয়, ইতিমধ্যেই সে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রও অর্জন করেছে। বিদেশের পুঁজির সঙ্গে তার গাঁটছড়া হয়েছে এবং তা ভারতীয় পুঁজিবাদকে সংহত করার জন্য, জনগণের উন্নতি করার জন্য নয়। তাই একটা কথা এই জায়গায় মনে রাখতে হবে। দেশের স্বার্থ, দেশের ঐক্য, জাতির কল্যাণ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই কথাগুলো ভাসাভাসা বললে হবে না। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ আমি চেয়েছি বলে হয়নি, আপনি চেয়েছেন বলে হয়নি, আপনার ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে।

তাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মালিকশ্রেণির স্বার্থ বা শোষকের স্বার্থ, আর শোষিতের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়। মালিকের স্বার্থ মজুরের স্বার্থ নয়, মজুরের স্বার্থ মালিকের স্বার্থ নয়। মালিকশ্রেণি, পুঁজিপতিদের স্বার্থ হচ্ছে এই ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। কারণ, এর থেকে তারা সর্বোচ্চ লাভ পাচ্ছে। শোষিত শ্রেণি, চাষি-মজুর, বেকার যুবকদের স্বার্থ হচ্ছে এই ব্যবস্থাটার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদকে ভেঙে ফেলা, কারণ এই ব্যবস্থাটা তাদের জীবনে শোষণ-বেকারি-দারিদ্র-বঞ্চনা আনছে। সেজন্যই শোষিতশ্রেণির স্বার্থবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশের বেশিরভাগ মানুষগুলোকে নিয়ে যদি দেশ হয়, শুধু মাটি আর খানিকটা পাথর যদি দেশ না হয়, তাহলে 'দেশের স্বার্থ' বলতে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লোকের স্বার্থের কথা কি তারা বলছে? নাকি ওই শতকরা ৫ ভাগ লোকের স্বার্থের কথা তারা বলছে? তারা যখনই দেশের স্বার্থের কথা বলবে, তখনই সেইসব শয়তানদের জিজ্ঞেস করতে হবে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত। তারা কি শোষক সেই ৫ ভাগ মানুষের স্বার্থবোধের কথা বলছে, নাকি শ্রমিক-চাষি, নিম্নমধ্যবিত্ত, বেকার যুবক, শোষিত-শ্রেণির স্বার্থে দেশের স্বার্থবোধের কথা বলছে? দু'জনের এক স্বার্থবোধ কখনও হতে পারে? অভিন্ন স্বার্থবোধের কথা বলতে পারে এক আকাট মুর্খ, নাহয় হাড় শয়তান — যেটা তাদের পছন্দ সেটা বেছে নিতে

পারেন, কোনও আপত্তি নেই। আমি একটু হাঁপিয়ে উঠছি, বোধ হয় আর বেশিক্ষণ বলতে পারব না, আপনারাও ধৈর্য নিয়ে অনেকক্ষণ শুনেছেন।

আমি আপনাদের বলতে চাইছি যে, ছাত্ররা, যুবকরা দেশের একটা বিরাট অংশ এবং জীবনের এই সময়টাই শেখবার, জানবার। এই সময়ে তারা খানিকটা ভারমুক্ত অবস্থায় থাকে, সমাজের অসহনীয় অবস্থার কথা ভাবতে পারে। অন্য সময় এই অবসর পায় না। এমনিই মানুষের জীবন অল্প, অল্প সময়ের জন্য আমরা বেঁচে থাকি। বেশি দিন নয়। খানিকটা সময় সেই শৈশবেই কেটে যায়, কৈশোরে কেটে যায়। তারপরে যৌবনের কর্মঠ অবস্থা কতদিন থাকে? তারপরে বৃদ্ধ হয়ে আমরা অকর্মণ্য হয়ে যাই। মানুষের জীবনের এই অমূল্য সময়টা হেলায় ফেলায় যেমন তেমন করে নষ্ট করার সময় নয়। জীবনের সেই মূল্যটাকে উপলব্ধি করা দরকার। ছাত্র অবস্থায় দেশ আপনাদের কাছে কী চায় তা উপলব্ধি করা দরকার। গোটা দেশের মানুষগুলোকে জাগাবার জন্য সবসময় প্রথমে একদল একনিষ্ঠ কর্মীর দরকার। সেটা সংগ্রহ হয় যুবক এবং বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে থেকে। সকল দেশের প্রগতির ইতিহাসে, সকল দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এটা ঘটেছে বার বার। কাজেই ছাত্ররা বিমুখ হয়ে থাকলে, অধোগামী সংস্কৃতির শিকার বনলে, পুঁজিবাদী রাজনীতির খপ্পরে পড়ে তাদের দালালি করলে সে জাতির মুক্তি নেই। দু'দিন বাদে তারা সংসারী হবে, তাদের ঘাড়ে বোঝা চাপবে, তাদের ঘরে বেকার সমস্যা ঢুকবে, তারা যে বড় মানুষ হবার সুখের স্বপ্ন দেখে, তার ঘরের ভিতরে নৈতিক অধঃপতন ঢুকে পরিবারকে তছনছ করে দেবে। ভালবেসে বিবাহ করবে, ভালবাসা পাবে না। খেটে, সর্বস্ব ত্যাগ করে যাদের মানুষ করবার চেষ্টা করবে, তারা সব ফিল্মস্টারদের চ্যালা হয়ে যাবে। তারা কী হবে, না হবে, কিচ্ছু ঠিক নেই। এই ভবিষ্যতকে যদি পাল্টাতে চান, যথার্থ মানুষের মতো যদি সত্যিই বাঁচতে চান, সকলকে বাঁচাতে চান, তাহলে আপনাদের, বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের এগিয়ে এসে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের ঝান্ডাটা উঁচু করে ধরতে হবে। এইটুকু বলে আমি আজকে শেষ করলাম।

১৯৭৪ সালের ১২ জানুয়ারী কটকে
সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের প্রকাশ্য
সমাবেশে ভাষণ।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৪